أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 93) www.motaher21.net

اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

" সবর, মুসাবারাহ, মুরাবাতাহ ও তাকওয়া অবলম্বন কর।"

সুরা: আলে-ইমরান

আয়াত নং :-200

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا

হে ঈমানদারগণ! সবরের পথ অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও, হকের খেদমত করার জন্য উঠে পড়ে লাগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।

২০০ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] এ আয়াতটিতে মুসলিমগণকে চারটি বিষয়ে নসীহত করা হয়েছে- ১. সবর, ২. মুসাবারাহ ৩. মুরাবাতা ও ৪. তাকওয়া, -যা এ তিনের সাথে অপরিহার্যভাবে যুক্ত। তন্মধ্যে 'সবর' এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা ও বাধা দেয়া। আর কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় এর অর্থ নফসকে তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের উপর জমিয়ে রাখা। এর তিনটি প্রকার রয়েছে- (এক) 'সবর আলাত্বা'আত'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল যে সমস্ত কাজের হুকুম করেছেন, সেগুলোর অনুবর্তিতা মনের উপর যত কঠিনই হোক না কেন তাতে মনকে স্থির রাখা। (দুই) 'সবর' আনিল 'মা'আসী' অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন, সেগুলো মনের জন্য যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, যত স্বাদেরই হোক না কেন, তা থেকে মনকে

বিরত রাখা। (তিন) 'সবর 'আলাল-মাসায়েব' অর্থাৎ বিপদাপদ ও কষ্টের বেলায় সবর করা, ধৈর্য ধারণ করা, অধৈর্য না হওয়া এবং দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে আগত মনে করে মন-মস্তিস্ককে সেজন্য অধৈর্য করে না তোলা। [ইবনুল কাইয়্যেম, আল-জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ দাওয়ায়িশ শাফী; মাদারিজুস সালেকীন]

[২] 'মুসাবারাহ' শব্দটি সবর থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ, শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করা। অথবা পরস্পর ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করা।

[৩] 'মুরাবাতাহ' অর্থ হলো, ঘোড়াকে বাঁধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়-

১. ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের হেফাযতে সুসজ্জিত হয়ে থাকা অপরিহার্য, যাতে ইসলামী সীমান্তের প্রতি শত্রুরা রক্তচক্ষু তুলে তাকাতেও সাহস না পায়। এটিই 'রিবাত' ও 'মুরাবাতাহ' এর বিখ্যাত অর্থ। এর দু'টি রূপ হতে পারেঃ প্রথমতঃ যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নেই, সীমান্ত সম্পূর্ণ শান্ত, এমতাবস্থায় শুধুমাত্র অগ্রিম হেফাযত হিসাবে তার দেখা-শোনা করতে থাকা। এক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনসহ সেখানে (সীমান্তে) বসবাস করতে থাকা কিংবা চাষাবাদ করে রুযী-রোজগার করাও জায়েয। এমতাবস্থায় যদি সীমান্ত রক্ষাই নিয়ত হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থায় রুযী-রোজগার করা যদি তারই আনুষঙ্গিক বিষয় হয়, তবে এমন ব্যক্তিরও 'রিবাত ফী সাবীলিল্লাহ'র সওয়াব হতে থাকবে। তাকে যদি কখনও যুদ্ধ করতে না হয়, তবুও। কিন্তু প্রকৃত নিয়ত যদি সীমান্তের হেফাযত না হয়, বরং রুযী-রোজগারই হয় মুখ্য, তবে দৃশ্যতঃ সীমান্ত রক্ষার কাজ করে থাকলেও এমন ব্যক্তি 'মুরাবিত ফী-সাবিলিল্লাহ' হবে না। অর্থাৎ সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সীমান্ত রক্ষাকারী বলে গণ্য হবে না। দ্বিতীয়তঃ সীমান্তে যদি শত্রুর আক্রমণের আশংকা থাকে, তবে এমতাবস্থায় নারী ও শিশুদিগকে সেখানে রাখা জায়েয নয়। তখন সেখানে তারাই থাকবে, যারা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে। এতদুভয় অবস্থায় 'রিবাত' বা সীমান্তরক্ষার অসংখ্য ফযীলত রয়েছে। এক হাদীসে সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়েদী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আল্লাহ্‌র পথে এক দিনের 'রিবাত' (সীমান্ত প্রহরা) সমগ্র দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে সে সমুদয় থেকেও উত্তম। [বুখারীঃ ২৭৯৪, মুসলিমঃ ১৮৮১]

অপর এক হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ একদিন ও একরাতের 'রেবাত' (সীমান্ত প্রহরা) ক্রমাগত এক মাসের সিয়াম এবং সমগ্র রাত ইবাদাতে কাটিয়ে দেয়া অপেক্ষা উত্তম। যদি এমতাবস্থায় কারো মৃত্যু হয়, তাহলে তার সীমান্ত প্রহরার পর্যায়ক্রমিক সওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার রিযক জারী থাকবে এবং সে কবরের ফেতনা বা পরীক্ষা (প্রশ্নোত্তর) থেকে নিরাপত্তা পাবে। [মুসলিমঃ ১৯১৩]

ফুদালাহ ইবনে উবায়েদ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় শুধুমাত্র মুরাবিত (ইসলামী সীমান্তরক্ষী) ছাড়া। অর্থাৎ তার কাজ কেয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং সে কবরের হিসাবনিকাশ থেকে নিরাপদ থাকবে। [আবু দাউদঃ ২৫০০]

এসব বর্ণনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ‘রিবাত’ বা সীমান্ত রক্ষার কাজটি সদকায়ে জারিয়া অপেক্ষাও উত্তম। কারণ, সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সদকাকৃত বাড়ী-ঘর, জমি-জমা, রচিত গ্রন্থরাজি কিংবা ওয়াক্‌ফকৃত জিনিসের দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে। যখন উপকারিতা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার সওয়াবও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে সীমান্ত প্রহরার সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। কারণ, সমস্ত মুসলিম সৎকর্মে নিয়োজিত থাকা তখনই সম্ভব, যখন তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকবে। ফলে একজন সীমান্তরক্ষীর এ কাজ সমস্ত মুসলিমদের সৎকাজের কারণ হয়। সে কারণেই কেয়ামত পর্যন্ত তার ‘রিবাত’ কর্মের সওয়াব অব্যাহত থাকবে। তাছাড়াও সে যত নেক কাজ দুনিয়ায় করত, সেগুলোর সওয়াবও আমল করা ছাড়াই সর্বদা জারী থাকবে।

২. কুরআন ও হাদীসে ‘রিবাত’ দ্বিতীয় যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে, জামা’আতের সাথে সালাত আদায়ে খুবই যত্নবান হওয়া এবং এক সালাতের পরই দ্বিতীয় সালাতের জন্য অপেক্ষামান থাকা। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের সংবাদ দিব না, যা করলে তোমাদের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং তোমাদের মর্যাদা বুলন্দ হবে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, অবশ্যই। তিনি বললেন, তা হচ্ছে, কষ্টকর স্থান বা সময়ে অযুর পানি সঠিকভাবে পৌছানো, মসজিদের প্রতি বেশী বেশী পদক্ষেপ এবং এক সালাতের পরে অপর সালাতের অপেক্ষায় থাকা। আর এটিই হচ্ছে, রিবাত”। [মুসলিম: ২৫১]

বাস্তবে উভয় অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রথম অর্থটি মানব শয়তানদের বিরুদ্ধে জিহাদের অংশ। আর দ্বিতীয় অর্থটি জিন শয়তানদের বিরুদ্ধে এক অমোঘ অস্ত্র। সুতরাং আয়াতে উভয় অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে।

এ আয়াতে আহলে কিতাবের সেই দলের কথা বলা হচ্ছে, যে দল আল্লাহ তা‘আলার প্রতি তাদের কাছে আগত রাসূল ও রিসালাতের প্রতি এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রিসালাতের ওপর ঈমান এনে ধন্য হয়েছে। তাদের ঈমান এবং ঈমানী গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে এমন সব আহলে কিতাব থেকে পৃথক করে দিলেন, যাদের কাজই ছিল ইসলাম, পয়গাম্বর এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা, আল্লাহ তা‘আলার আয়াতের পরিবর্তন ও তার অপব্যাখ্যা করা এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদ লাভের জন্য দীনকে পরিবর্তন ও প্রকৃত জ্ঞানকে গোপন করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(لَيْسُوْا سَوَاۤءً ط مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاۤءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ)

“তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে একটি দল রয়েছেন দীনের ওপর অটল। তারা রাতের বেলা আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করে এবং সিজদা করে।” (সূরা আলি-ইমরান ৩:১১৩)

ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন: এ আয়াতে আহলে কিতাবের যে সকল মু'মিনদের কথা উল্লিখিত হয়েছে ইয়াহূদীদের মধ্য থেকে তাদের সংখ্যা দশ জনও হবে না, তবে খ্রিস্টানদের মধ্যে বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে সত্য দীনের অনুসারী হয়েছে। (ইবনু কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

আব্বাদ বিন মানসূর বলেন: এ আয়াত সম্পর্কে হাসান বাসরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন: তারা হল আহলে কিতাব যারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পূর্বে ছিল। তারা ইসলাম গ্রহণ করে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ করছে। তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন।

যে সকল আহলে কিতাবগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদের অনেক ফযীলত সহীহ হাদীসে প্রমাণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তিন শ্রেণির মানুষকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়া হবে। তার মধ্যে একশ্রেণি হল যে সকল আহলে কিতাবগণ তাদের নাবীর ওপর ঈমান এনেছে অতঃপর আমার প্রতি ঈমান এনেছে। (সহীহ বুখারী হা: ৯৭)

اصْبِرُوْا ধৈর্যধারণ করা, অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদেশ বাস্তবায়নে এবং তাদের নিষেধ পরিত্যাগ করার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা।

صَابِرُوْا “ধৈর্য ধারণে প্রতিযোগিতা কর” যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে শত্র“র মোকাবেলায় অনড় থাকা। এটা হল ধৈর্যের কঠিনতম অবস্থা। এ জন্যই এটাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

رَابِطُوْا যুদ্ধের ময়দানে অথবা প্রতিপক্ষের সামনে সংঘবদ্ধভাবে সব সময় সতর্ক ও জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকা। এটাও উচ্চ সাহসিকতা ও বড় উদ্দীপনার কাজ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তা‘আলার পথে একদিন প্রতিরক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম। (সহীহ বুখারী হা: ২৮৯২)

এ ছাড়াও হাদীসে কষ্টের সময়ে সুন্দরভাবে ওযু করা, মাসজিদের দিকে বেশি বেশি পদক্ষেপ ফেলা এবং এক সালাতের পর অপর সালাতের জন্য অপেক্ষা করাকেও রিবাত (জিহাদে প্রতিরক্ষার কাজের ন্যায়) বলা হয়েছে। (সহীহ মুসলিম হা: ২৫১)

আল্লামা জাযায়েরী (রহঃ) বলেন: সৈন্যদলের সাথে সর্বদা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা যাতে শত্র“বাহিনী কোনক্রমেই মুসলিম দেশে প্রবেশ করতে না পারে। (আইসারুত তাফাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

সুতরাং আহলে কিতাবের সবাই সমান নয়, কেউ কেউ তাদের কাছে আগত কিতাবের প্রতি ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং শেষ নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিও ঈমান এনেছে। তাদের জন্য সুসংবাদ।

☆ আলোচ্য আয়াতে মুমিনদেরকে চারটি বিষয়ে নসিহত করা হয়েছে (১) সবর (২) মুসাবারাহ (৩) মুরাবাতাহ ও (৪) তাকওয়া।

(১) **সবর ঃ** শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা ও বাঁধা আর কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় এর অর্থ নফসকে তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের উপর দৃঢ় রাখা। এর তিনটি প্রকার রয়েছে (ক) সবর 'আরাওয়াত' অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) যে সমস্ত কাজের হুকুম করেছেন সেগুলোর অনুবর্তিতা মনের উপর যত কঠিনই হোকনা কেন তাতে মনকে স্থির রাখা। (খ) সবর আনিল মাআসী অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) নিষেধ করেছেন সেগুলো মনের জন্য যত আকর্ষণীয়ই হোকনা কেন, যত স্বাদেরই হোকনা কেন তা থেকে মনকে বিরত

রাখা। (গ) সবর আলা মাসায়ের অর্থাৎ বিপদাপদ ও কষ্টের বেলায় সবর করা। দুঃখ-কষ্ট, সুখ-শান্তিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত মনে করে মন মস্তিষ্ককে সেজন্য অধৈর্য করে না তোলা।

(২) **মুসাবারাহ ঃ** শব্দটি সবর থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ শত্রুর মুকাবিলায় দৃঢ়তা, অনমনীয়তা অবলম্বন করা। ইহারও দুইটি দিক আছে (ক) কাফিররা কুফরীর জন্য যে দৃঢ়তা প্রদর্শন করছে একে জয়ী করার জন্য যেরূপ কষ্ট স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করছে তাদের মোকাবেলায় তোমরা তাদের চেয়েও অধিক শৌর্য-বীর্য ও দৃঢ়তা দেখাও (খ) কাফেরদের সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা প্রদর্শনে তোমরা পরস্পর প্রতিযোগিতা কর।

(৩) **রেবাত বা মুরাবাতা ঃ** ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের হেফাযত করার লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করার নামই রেবাত বা মুরাবাতা। এরও দু'টি রূপ হতে পারে (ক) সীমান্ত সম্পূর্ণ শান্ত এমতাবস্থায় শুধুমাত্র অগ্রীম সতর্কতা বা হেফাযত হিসেবে তার দেখাশোনা করতে থাকা। এমতাবস্থায় যদি সীমান্ত রক্ষাই নিয়ত হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থায় রুযী রোজগার তারই আনুসাঙ্গিক বিষয় হয় তবে এমন ব্যক্তিরও রেবাত ফি সাবিলিল্লাহর সাওয়াব হতে থাকবে। তাকে যদি কখনো যুদ্ধ করতে না-ও হয় তবুও। (খ) সীমান্ত যুদ্ধাবস্থায় থাকা। এই উভয় অবস্থায় সীমান্ত রক্ষার অসংখ্য ফজিলত রয়েছে। মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে হযরত রাসূল করীম (সাঃ) থেকে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন– একদিন ও একরাতের বেরাত (সীমান্ত প্রহরা) ক্রমাগত একমাসের রোজা এবং সমগ্ররাত এবাদতে কাটিয়ে দেয়া অপেক্ষাকৃত উত্তম। যদি এমতাবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করে থাকে তবে তার সীমান্ত প্রহরার পর্যায়ক্রমিক সওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকবে। বুখারী শরীফে রয়েছে আল্লাহর পথে একদিনের রেবাত সমগ্র দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু আছে তা থেকেও উত্তম।

সমস্ত মুসলমানদের সৎকর্মে নিয়োজিত থাকা তখনই সম্ভব যখন তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে। ফলে এক জন সীমান্তরক্ষীর এই কাজ সমস্ত মুসলমানদের সৎ কাজের কারণ হয়। যে কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত তার রেবাত তথা সীমান্ত প্রহরার সওয়াব অব্যাহত থাকবে।

৪) **তাকওয়া ঃ** অর্থাৎ প্রতিমূহূর্তে আল্লাহকে ভয় করা। সূরা আল ইমরানের ১০২ নং আয়াতে তাকওয়ার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাকওয়া সমস্ত কাজের প্রাণশক্তি। সেইরূপ উপরোক্ত তিনটি কাজেরও ফল আমরা তখনই পাব যখন এর সাথে তাকওয়া যুক্ত থাকবে। কুরআনে কল্যাণ বলতে যা বুঝায় সেটা বৃহত্তর পরিসরে

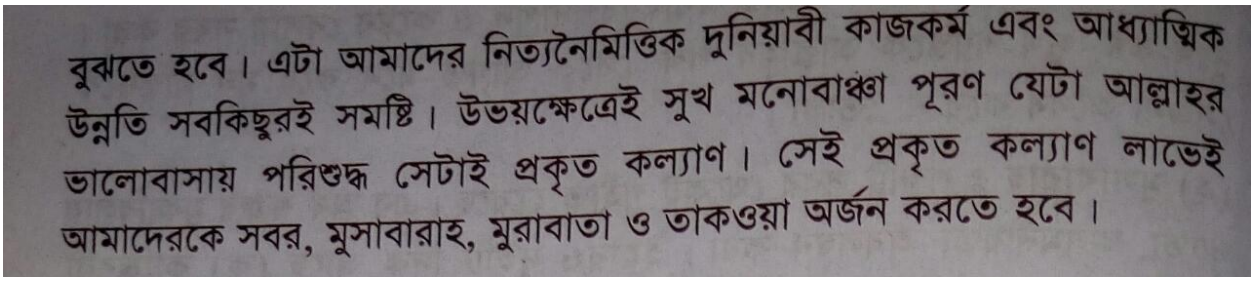
বুঝতে হবে। এটা আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক দুনিয়াবী কাজকর্ম এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সবকিছুরই সমষ্টি। উভয়ক্ষেত্রেই সুখ মনোবাঞ্ছা পূরণ যেটা আল্লাহর ভালোবাসায় পরিশুদ্ধ সেটাই প্রকৃত কল্যাণ। সেই প্রকৃত কল্যাণ লাভেই আমাদেরকে সবর, মুসাবারাহ, মুরাবাতা ও তাকওয়া অর্জন করতে হবে।

তাকওয়াঃ- لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ '' এর تقو তাকওয়া শব্দের মুল ধাতু وقي এর অর্থ বাঁচা। তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ হলো ভয় করা। পারিভার্ষিক অর্থ হলো:- ''আল্লাহ ও তার রাসুলের সকল আদেশ মানা নিষিদ্ধ কাজ থেকে দুরে থাকা।''

অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করতে হবে, তার আদেশ নিষেধ মানতে হবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। সকল ফরজ, ওয়াজিব পালন করে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে তাকওয়া।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন: ''তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা, তার নাফরমানী না করা, আল্লাহকে স্মরন করা, তাকে ভুলে না যাওয়া এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ও তার কুফরী না করা।''

তাকওয়ার ব্যপারে অনেক ভুল বুঝাবুঝি আছে। কিছু লোক আছে যারা ইসলামের ফরজ ওয়াজিব এবং হারাম কাজ সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিফহাল নন, তারা বিশেষ কিছু সুন্নত ও নফল কাজ করে নিজেদেরকে মোত্তাকী এবং মোত্তাকী নয় বলে মনে করে । তারা হাতে তাসবীহ, মাথায় টুপি- পাগড়ী, মুখে লম্বা দাঁড়ি, গায়ে লম্বা জামা এবং পেশাব পায়খানায় ঢিলা ব্যবহার করাকে তাকওয়ার মাপকাঠি মনে করে। অথচ এগুলো সুন্নত ও মোস্তাহাবের বেশী কিছু নয়। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক. অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের অগনিত ফরজ ওয়াজিব রয়েছে যেগুলো তারা পালন করে না এবং সেগুলোর খবরও রাখেনা । যেমন পর্দাহীনতা, সুদ, ঘুষ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ, দাওয়াতে দ্বীন, দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ইত্যাদি পালনের ব্যাপারে তারা উদাসীন। পক্ষান্তরে, যারা এসব কাজ করেন এবং সেজন্য জান- মাল উৎসর্গ করেন তাদেরকে তারা মোত্তাকী বলতে নারাজ। অথচ তারাই সত্যিকার অর্থে মোত্তাকী। তারাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতিতে জানমালের সর্বাতœক কোরবানী করে তাকওয়ার চুড়ান্ত পরাকাষ্ঠ দেখান। তারা বিজয়ী গাজী কিংবা শহীদ হন। তারাই যদি মোত্তাকী না হয় তাহলে যারা এত সস্তা আমল করে এবং কঠিন আমল থেকে দুরে থেকে তারা মোত্তাকী হন কোন যুক্তিতে? তাকওয়াতে শুধুমাত্র কিছু সুন্নাত ও সীমিত ফরজ কাজ আদায়ের নাম নয়। মোত্তাকী হতে হলে ব্যাক্তিগত, পারিবারিক. সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক নীতি সহ শিক্ষা ও অন্যান্য সকল বিষয়ে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ জানতে হবে ও মানতে হবে ।

এক ধরনের ভন্ড পীর- ফকির ও দরবেশ আছে যারা বহু অনৈসলামী কাজ করে নিজেদেরকে মোত্তাকী এবং আল্লাহর প্রেমিক বলে দাবী করে। তাদের হাতে তাসবীহ ও লাঠি, মুখে গাজা ও দাঁড়ি এবং পরনে বিভিন্ন ধরনের কাপড় থাকে। কবর পূজা তাদের প্রধান কাজ। এগুলো তাকওয়াতো দুরের কথা বরং তার থেকে অনেক অনেক দুরের জিনিস। কেননা তাকওয়ার অর্থ হল আসল ফরজ ওয়াজিব মানা এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে তারা হারাম কাজ সব করে এবং ফরজ ওয়াজিব থেকে দূরে থাকে। এরা দোজখের ইন্ধন ছাড়া আর কি? দ্বিতীয় খলিফা, ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) উবাই বিন কা'ব (রাঃ) তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উবাই (রাঃ) বলেন : আপনি কি কাঁটা যুক্ত পথে চলেছেন? ওমর (রাঃ) বলেন 'হ্যা। উবাই (রাঃ) বলেন, কিভাবে চলেছেন? ওমর (রাঃ) বলেন গায়ে যেন কাঁটা না লাগে সে জন্য চেষ্টা করেছি ও সতর্ক ভাবে চলেছি। উবাই (রাঃ) বলেন, এটাই হচ্ছে তাকওয়ার উদাহারন।

অর্থাৎ সমাজে, জীবনে চলার পথে প্রতিটি পদক্ষেপ এমন সাবধানে চলা যাতে কোন পদক্ষেপই আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের (স:) এর বিরোধী না হয়। এখানে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের বিরোধী কাজকে পথের কাঁটা হিসাবে উদাহারন দেয়া হয়েছে। কাঁটাযুক্ত পথে যেভাবে সতর্কতার সাথে কাঁটা এড়িয়ে চলতে হয় ঠিক সেভাবেই আল্লাহ এবং তার রাসুল (সঃ) এর বিরোধী প্রতিটি কাজকর্ম প্রতি মূহুর্তে সাবধানে পরিত্যাগ করতে হবে। তাহলেই তাকওয়া অর্জিত হবে। নিম্মোক্ত আয়াতে আল্লাহ সকল যুগের মানুষদেরকেই তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেছেন-

و لقد وصبنا الذين اوتو الكتا من قبلكم واياكم ان التقو الله (النساء-١٣١)

"আমি তোমাদের পূর্বের আহলে কিতাবদের এই উপদেশ দিয়েছিলাম আর যখন তোমাদেরকেও উপদেশ দিতেছি যে, তাকওয়া অবলম্বন করা।

(সুরা-৪, নিসা-১৩১)

* তাকওয়ার ফায়দা কি?

তাকওয়া অবলম্বনের ফলে এই দুনিয়া তথা ইহকালে ১৫ (পনের) টি ফায়দা লাভ করা যায়ঃ-

(১) তাকওয়ার ফলে মানুষের জটিল বিষয়গুলো সহজ হয়ে যায়।

(4-الطلاق) و من يتق الله يجعله من امره يسرا

“ আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অনুসরণ করলে আল্লাহ বান্দার বিভিন্ন বিষয়গুলো সহজ করে দেবেন।

(সুরা-৬৫, তালাক-৪

(২) তাকওয়ার ফলে মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে ঃ

(২০১ الاعراف) إن الذين التقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون

“যারা তাকওয়া অনুসরণ করে, শয়তানতাদেরকে ক্ষতি করার জন্য স্পর্শ করলে তারা সাথে সাথে আল্লাহকে স্মরন করে। তখন তারা তাদের জন্য সঠিক ও কল্যাণকর পথ সুপষ্ঠভাবে দেখতে পায়। (সুরা-৭, আরাফ-২০১)

(৩) তাকওয়ার ফলে আসমান ও যমীনের বরকতের দরজা খুলে যায়ঃ

(৯৬-الاعراف) ولو ان اهل القري امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الرض

“ জনপদবাসীরা ঈমান ও তাকওয়ার অনুসরণ করলে, আমরা তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকত সমূহ উম্মুক্ত করে দেব।

(সুরা-৭, আরাফ-৯৬)

(৪) হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার তাওফিক লাভ করেঃ

(২৯-الانفال) يايها الذين امنو ان تتقو الله يجعلكم فرقانا

“হে ঈমানদারগন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তোমাদের জন্য সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার মানদন্ড দান করবেন।

(সুরা-৮, আনফার-২৯)

(৫) সংকট থেকে উদ্ধার এবং অভাবিত রিযক দান করবেন।

ومن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب- (الطلاق-২০)

“যে আল্হাকে ভয় করে তাকওয়া অনুসরণ করে, আল্লাহ তাকে সংকট থেকে উদ্ধার করবেন এবং তাকে অভাবিত রিযক দান করবেন। সুরা-৬৫, তালাক-২০)

(৬) আল্লাহর অলী ও বন্ধু হওয়া যায়ঃ

إن او لياءه الا المتقون- (الانفال-৩৪)

“নিশ্চই মুত্তাকী ছাড়া কেহ তার বন্ধু নয়।” (সূরা আনফাল-৩৪)

(৭) আল্লাহর ভালবাসা লাভ করা যায়ঃ

فان الله يحب المتقين- (العمران-৭৬)

“আর নিশ্চই আল্লাহ মোত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।”

(সুরা-৩, আল-ইমরান-৭৬)

(৮) আল্লাহর সাহচর্য লাভ করা যায়:

(১৯৪-البقرة) -و اتقو الله واعلمو ان الله مع المتقين

“যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, নিশ্চই আল্লাহ মোত্তাকীদের সাথে আছেন।’’

(সুরা-২, বাকারা-১৯৪)

(৯) মোত্তাকীর আমল কবুল হয়ঃ

(৫৭-المائدة) إنما يتقبل الله من المتقين

“আল্লাহ অবশ্যই মোত্তাকীদের আমল কবুল করেন।’’

(সুরা-৫, মায়েদা-৫৭)

(১০) দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কোন ভয় ভীতি নেইঃ

(৩৫-الاعراف) فمن اتقي واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

“যারা তাকওয়া অর্জন করে ও নিজের আচার আচরণকে সংশোধন করে, তাদের কোন ভয়- ভীতি ও পেরেশানী নেই।’’ (সুরা-৭, আরাফ-৩৫)

(১১) গুনাহ মাফ ও বিশাল পুরস্কার দেয়া হবেঃ

(৫-الطلاق) -و من يتق الله يكفر عنه سيئاته و يعظم له اجرا

“যে আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার গুনাহ মোচন করবেন এবং তাকে মহা পুরস্কার দেবেন।’’ (সুরা-৬৫, তালাক-৫)

(১২) তাকওয়া উত্তম সম্বলঃ-

(البقرة-١٩٧) -و تزودو فان خير الزاد التقوى

"তোমরা সম্বল সংগ্রহ কর। তবে তাকওয়াই হলো উত্তম সম্বল।" (সুরা-২, বাকারা-১৯৭)

(১৩) মোত্তাকী আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিতঃ

(الحجرات-١٣) -إن اكرمكم عند الله اتقاكم

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যাক্তিই উত্তম আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত যে অধিকতর তাকওয়ার অনুসারী।" (সুরা-৪৯,হুজরাহ-১৩)

(১৪) আল্লাহ মুমিন মোত্তাকীকে নাযাত দেনঃ

(حم السجدة-١٨) – ونجينا الذين أمنو و كانوا يتقون

"যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে আমরা তাদেরকে নাযাত দিয়েছি।" (সুরা-৪১,হামীম আস সেজদা-১৮)

(১৫) "তাকওয়া অবলম্বন কারীদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সুসংবাদ ঃ

(يونس-٦٣-٦٤) -الذين امنو و كانوا يتقون- لهم البشرى في الحيوة الدنيا و في الاخرة

"যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে

সুসংবাদ।" (সুরা-১০, ইউনুস-৬৩-৬৪)

* তাকওয়া অবলম্বনের ফলে আখিরাত তথা পরকালে নিম্মোক্ত ৭টি ফায়দাঃ

(১) মোত্তাকীরা বেহেশত লাভ করবে:

(الدخان-٥١-٥٢) -إن المتقين في مقام امنن- في جنت و عيون

"নিশ্চই মোত্তাকীরা নিরাপদ স্থানে, জান্নাত ও ঝর্ণাধারার মধ্যে অবস্থান করবে।"

(সুরা-৪৪, দুখান-৫১-৫২)

(২) মোত্তাকীদেরকে দলে দলে বেহেশতে নেয়া হবেঃ

(الزمر -٧٣) -وسيق الذين التقوا ربهم إلي الجنة زمرا

"যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নেয়ে যাওয়া হবে।" (সুরা-৯, যুমার-৭৩)

(৩) মোত্তাকীরা আল্লাহর প্রতিনিধি দলের মর্যাদা পাবেঃ

(مريم-٨٥) -يوم نحشر المتقين إلي الرحمن وفد

"সেদিন মোত্তাকীদেরকে দয়ালু আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে উঠানো হবে।"

(সুরা-১৯,মরিয়ম-৮৫)

(৪) মোত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে আসমান- যমেিনর সমান প্রশস্ত জান্নাতঃ

(العمران-١٣٣) – و سارعو إلي مغفرة من ربكم و جنت عرضها السموت والرض اعد للمتقين

“তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুতগামী হও; যার প্রশস্ততা হলো আসমান-যমিনের সমান ; এটা মোত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।’’

(সুরা-৩, আল-ইমরান-১৩৩)

(৫) মোত্তাকীরা আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকবেঃ

إن المتقين في جنت و نهر – في مقعد صدق عند مليك مقتدر -(القمر-৫৪-৫৫)

“মোত্তাকীরা থাকবে জান্নাত ও নহরে, সত্যের আসনে, সর্বাধিপতি শাহানশাহের সান্নিধ্যে।’’

(সুরা-৫৪, কামার-৫৪-৫৫)

(৬) আল্লাহ মোত্তাকীদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।

ثم ننجي الذين التقوا و نذر الظالمين فيها جثيا- مريم-৭২)

“অতঃপর আমি মোত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবো এবং জালেমদেরকে সেখান থেকে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেবো।’’ (সুরা-১৯, মরিয়ম-৭২)

(৭) মোত্তাকীদের ছাড়া কেয়ামতের দিন অন্য সকল বন্ধু শত্র“তে পরিণত হবেঃ

الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين -(الزخرف-৬৭)

“মোত্তাকীদের ছাড়া ঐ দিন সকল বন্ধু শত্র“তে পরিণত হবে।’’ (সুরা-৩৩, যুখরুফ-৬৭)

এ হলো তাকওয়ার কিছু উপকারীতা ও ফায়দা। যেগুলো নগদ এই দুনিয়াতে এবং পরকালে পাওয়া যাবে। কুরআন এবং হাদিছে তাকওয়ার আরো বহু পুরস্কারের কথা উল্লেখ আছে। তাই সবারই তাকওয়া অর্জনে আপ্রাণ চেষ্ট করা উচিত। সেজন্যই আল্লাহ বলেছেনঃ-

(١٠٢ -العمران) -واتقو الله حق تقاته

"তোমরা আল্লাহকে তাকওয়ার যথার্থ দাবী পূরন করে ভয় করো।'' (সূরা-৩, আল ইমরান-১০২)।

অতএব আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা , আমাদের রব মহান আল্লাহকে যথাযথ ভাবে জানব, বুঝব, এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তার যথাযথ ইবাদাত করব। আল্লাহ মানবজাতিকে সেই তাওফিক দান করুন-আমিন।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আহলে কিতাবের মধ্যে যারা তাদের নাবী ও শেষ নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান এনেছে তাদের মর্যাদা জানতে পারলাম।

২. ধৈর্য ধারণ ও আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় পাহারা দেয়া ফযীলতের কাজ।

৩. মু'মিনরা সর্বদা শত্র"দের বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে থাকবে।

সুরা: আন-নিসা

আয়াত নং :-১৯

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ۗ وَ لَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা মোটেই হালাল নয়। আর তোমরা যে মোহরানা তাদেরকে দিয়েছো তার কিছু অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসাৎ করাও তোমাদের জন্য হালাল নয়। তবে তারা যদি কোন সুস্পষ্ট চরত্রহীনতার কাজে লিপ্ত হয় (তাহলে অবশ্যি তোমরা তাদেরকে কষ্ট দেবার অধিকারী হবে) তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। যদি তারা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়, তাহলে হতে পারে একটা জিনিস তোমরা পছন্দ করো না কিন্তু আল্লাহ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।

১৯ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোন লোক মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীগণ মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর পূর্ণ দাবীদার মনে করত। তারা ইচ্ছে করলে তাকে নিজেরাই বিবাহ করে নিত। ইচ্ছে করলে অন্যের সাথে বিবাহ দিয়ে দিত, আবার ইচ্ছে করলে বিয়েই দিত না। তারাই স্ত্রীলোকটির আত্মীয়-স্বজন থেকে বেশি হকদারের দাবী করত। তখন এ আয়াত নাযিল হয়

(يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا)

(সহীহ বুখারী হা: ৪৫৭৯) এছাড়াও আরো নির্ভরযোগ্য শানে নুযূল রয়েছে। (লুবানুল নুকূল ফী আসবাবে নুযূল, পৃঃ ৭৮)

(وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ)

'তাদেরকে বন্দি করে রেখ না' এটি ছিল স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর প্রতি অন্যতম আরো একটি জুলুম। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যদি কোন লোকের অপছন্দনীয় স্ত্রী থাকত তাহলে তার সাথে স্বামী অশালীন আচরণ করত, জীবন যাপনে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করত যাতে সে তার স্বামীর প্রদত্ত মাহরানা ফিরিয়ে দিয়ে চলে যায়। (ইবনে কাসীর, ২/২৬৭, অত্র আয়াতের তাফসীর)

ইসলাম এরূপ আচরণ হারাম করেছে। কারো প্রয়োজন না থাকলে কিম্বা উভয়ের মাঝে সমন্নয় সম্ভব না হলে ভালভাবে তালাক দিয়ে দেবে।

(بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ)

'তারা যদি প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়' ইবনু আব্বাস (রাঃ), হাসান বসরীসহ প্রমুখ মুফাসসীরগণ বলেন, প্রকাশ্য অশ্লীলতা হল ব্যভিচার। যদি স্ত্রী ব্যভিচার করে তাহলে স্বামীর বৈধতা রয়েছে সে তার প্রতি সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে তার প্রদত্ত মাহর ফিরিয়ে নেবে। তারপর সে মহিলা খোলা তালাক দিয়ে চলে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ২২৯ নং আয়াতে বলেছেন।

তারপর আল্লাহ তা'আলা পুরুষদেরকে তাদের স্ত্রীদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম। আমি আমার পরিবারের নিকট উত্তম। (তিরমিযী হা: ৩৮৯৫, ইবনু হিব্বান হা: ১৩১২, সহীহ)

স্ত্রীদের কোন দিক দিয়ে ত্র"টি থাকলেও অন্যদিক দিয়ে তাদের মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

কোন মু'মিন পুরুষ মু'মিন নারীকে যেন ঘৃণা না করে। তার কোন একটি দিক খারাপ লাগলেও অন্য কোন দিকে তাকে ভাল লাগবে। (সহীহ মুসলিম হা: ১৪৬৯) তাই একজন স্বামীর উচিত সাধারণ ভুল-ত্র"টির জন্য স্ত্রীকে মারধর বা তালাক না দিয়ে বুঝানো, শিক্ষা দেয়া।

قِنْطَارًا 'প্রচুর সম্পদ' যদি কোন লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য কোন নতুন স্ত্রী গ্রহণ করতে চায় তাহলে তার স্ত্রীকে যে প্রচুর পরিমাণ মাহরানা প্রদান করেছে তা ফেরত নেবে না। কিভাবে সে মাহরানা ফিরত নেবে অথচ তারা পরস্পর দৈহিক সম্পর্ক করেছে আর তারা তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় প্রতিশ্র"তি নিয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে আল্লাহ তা'আলার আমানতে গ্রহণ করেছো আর তাদের লজ্জাস্থান আল্লাহ তা'আলার কথায় বৈধ করে নিয়েছো। (সহীহ মুসলিম হা: ১২১৮)

এর অর্থ হচ্ছে, স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিবারের লোকেরা তার বিধবাকে মীরাসী সম্পত্তি মনে করে তার অভিভাবক ও ওয়ারিস হয়ে না বসে। স্বামী মরে গেলে স্ত্রী ইদ্দত পালন করার পর স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা যেতে এবং যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারে।

তাদের চরিত্রহীনতার শাস্তি দেবার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তাদের সম্পদ লুট করে খাবার জন্য নয়।

অর্থাৎ স্ত্রী যদি সুন্দরী না হয় অথবা তার মধ্যে এমন কোন ত্রুটি থাকে যে জন্য স্বামী তাকে অপছন্দ করে তাহলে এক্ষেত্রে স্বামীর তৎক্ষণাৎ হতাশ হয়ে তাকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হওয়া উচিত নয়। যতদূর সম্ভব তাকে অবশ্যি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, স্ত্রী সুন্দরী হয়না ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে অন্যান্য এমন কিছু গুণাবলী থাকে, যা দাম্পত্য জীবনে সুন্দর মুখের চাইতে অনেক বেশী গুরুত্ব লাভ করে। যদি সে তার এই গুণাবলী প্রকাশের সুযোগ পায়, তা হলে তার স্বামী রত্নটি যিনি প্রথম দিকে শুধুমাত্র স্ত্রীর অসুন্দর মুখশ্রী দেখে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন, এখন দেখা যাবে তার চরিত্র মাধুর্যে তার প্রেমে আত্মহারা হয়ে পড়ছেন। এমনিভাবে অনেক সময় দাম্পত্য জীবেনর শুরুতে স্ত্রীর কোন কোন কথা ও আচরণ স্বামীর কাছে বিরক্তিকর ঠেকে এবং এ জন্য স্ত্রীর ব্যাপারে তার মন ভেঙে পড়ে। কিন্তু সে ধৈর্য্য ধারণ করলে এবং স্ত্রীকে তার সম্ভাব্য সকল যোগ্যতার বাস্তবায়নের সুযোগ দিলে সে নিজেই অনুধাবন করতে পারে যে, তার স্ত্রীর মধ্যে দোষের তুলনায় গুণ অনেক বেশী। কাজেই দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা মোটেই পছন্দনীয় নয়। তালাক হচ্ছে সর্বশেষ উপায়। একান্ত অপরিহার্য ও অনিবার্য অবস্থায়ই এর ব্যবহার হওয়া উচিত। নবী ﷺ বলেনঃ

أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاَقُ

অর্থাৎ তালাক জায়েয হলেও দুনিয়ার সমস্ত জায়েয কাজের মধ্যে এটি আল্লাহর কাছে সবচাইতে অপছন্দনীয়।

অন্য একটি হাদীসে নবী ﷺ বলেনঃ

تَزَوَّجُوا وَلاَ تَطَلِّقُوا فَانّ الله لاَيُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ والذَّوَّاقَاتِ

“বিয়ে করো এবং তালাক দিয়ো না। কারণ আল্লাহ এমন সব পুরুষ ও নারীকে পছন্দ করেন না যারা ভ্রমরের মতো ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে বেড়ায়।”

ইসলামপূর্ব যুগে পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর জান ও মালের মালিক মনে করতো। স্ত্রী যার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতো, সে তার প্রাণকে নিজের মালিকানাধীন মনে করতো। স্বামীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশরা যেমন তার ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিশ ও মালিক হতো, তেমনি তার স্ত্রীরও ওয়ারিশ ও মালিক বলে গণ্য হতো। ইচ্ছা করলে নিজেই তাকে বিয়ে করতো কিংবা অন্যের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তাকে বিয়ে দিয়ে দিতো। স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র নিজেও পিতার মৃত্যুর পর তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারতো। স্ত্রীর প্রাণেরই এই অবস্থা, তখন তার ধন-সম্পদের ব্যাপারটি তো বলাই বাহুল্য। যেসব অর্থ-সম্পদ স্ত্রী

উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা পিত্রালয় থেকে উপঢৌকন হিসেবে লাভ করতো, তারা সেগুলো হজম করে ফেলতো। যদি কোন নারী তার নিজের অংশের ধন-সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই নিত, তবে পুরুষরা তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দিত; যাতে সে এখানেই মারা যায় এবং ধন-সম্পদ তাদের অধিকারভুক্ত থেকে যায়। কোন কোন সময় স্ত্রীর কোন দোষ না থাকলেও তাকে তার প্রাপ্য প্রদান করতো না। আবার তালাক দিয়েও তাকে মুক্ত করত না। তালাক দিলেও অন্যত্র বিয়ে দিত না। যাতে তার মাহ্‌রের টাকা বাইরে না যায়। ইসলাম এসব কিছুর মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। এ আয়াত সংক্রান্ত বেশ কিছু বর্ণনায় তা স্পষ্ট। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ইসলামপূর্ব যুগে কোন লোক মারা গেলে তার অভিভাবকরা তার স্ত্রীর অধিকারী হয়ে যেত। সে ইচ্ছে করলে তাকে বিয়ে করত অথবা অন্যের নিকট বিয়ে দিয়ে দিত। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। [বুখারী ৪৫৭৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, কায়েস ইবন সালত এর পিতা মারা গেলে তার ছেলে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করতে চাইল। জাহেলিয়াতে যা তাদের অভ্যাস ছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [নাসায়ী: ১১৫]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে স্পষ্ট খারাপ আচরণ বলতে, স্বামীর অবাধ্যতা ও স্বামীর সাথে শত্রুতা বোঝানো হয়েছে। যে মহিলা স্বামীর অবাধ্য সে মহিলা থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য পুরুষটি তাকে দেয়া সম্পদ ফেরৎ নিতে পারবে। [তাবারী]

অর্থাৎ তাদের সাথে উত্তম কথা বলবে। কথায়, কাজে, চলাফেরায় যতটুকু সম্ভব সৌন্দর্য রক্ষা করবে। যেমনটি তুমি তাদের কাছ থেকে আশা কর, তেমন ব্যবহারই করো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো ঐ ব্যক্তি যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম'। [তিরমিযীঃ ৩৮৯৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক সৌন্দর্যের মধ্যে এটা ছিল যে, তিনি সদাহাস্য সুন্দর ব্যবহার করতেন। পরিবারের সাথে হাস্যরস, নরম ব্যবহার ইত্যাদি করতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে কখনো কখনো দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। [দেখুন- আবু দাউদঃ ২৫৭৮, ইবন মাজাহঃ ১৯৭৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৬/১২৯]

অর্থাৎ এমনও হতে পারে যে, ধৈর্যধারণ করে তাদের সাথে জীবনযাপন করলে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা অনেক ভাল কিছু এর বিনিময়ে রেখেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ এর অর্থ হল স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসবে, তারপর তাদের মধ্যে আল্লাহ সন্তান দান করবেন যে সন্তান তাদের মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিয়ে আসবেন বা স্বামীর মনে স্ত্রীর জন্য ভালবাসা তৈরী করে দিবেন। [তাবারী] এছাড়া হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'মুমিন পুরুষ

কোন মুমিন নারীকে ঘৃণা করবে না। যদি তার কোন চরিত্রের কোন একটি দিক তাকে অসন্তুষ্ট করে, তবে অন্য দিক তাকে সন্তুষ্ট করবে'। [মুসলিমঃ ১৪৬৯]

ইসলাম আসার পূর্বে মহিলার প্রতি এই অবিচারও করা হত যে, স্বামী মারা গেলে তার (স্বামীর) পরিবারের লোকেরা সম্পদ-সম্পত্তির মত এই মহিলারও জোরপূর্বক উত্তরাধিকারী হয়ে বসত এবং নিজ ইচ্ছায় তার সম্মতি ছাড়াই তাকে বিবাহ করে নিত অথবা তাদের কোন ভাই ও ভাইপোর সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিত। এমন কি সৎ বেটাও মৃত পিতার স্ত্রী (সৎ মা)-কে বিবাহ করত অথবা ইচ্ছা করলে তাকে অন্য কোথাও বিবাহ করার অনুমতি দিত না এবং সে তার পূর্ণ জীবন বিয়ে ছাড়াই (বিধবা অবস্থায়) অতিবাহিত করতে বাধ্য হত। ইসলাম এই ধরনের সমস্ত প্রকারের যুলুম থেকে নিষেধ করেছে।

আরো একটি যুলুম এই ছিল যে, যদি কোন স্বামীর স্ত্রী পছন্দ না হত এবং সে তার নিকট থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইত, তাহলে (এই রকম পরিস্থিতিতে ইসলাম যেভাবে তালাক দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে সেভাবে) সে তাকে তালাক না দিয়ে তার উপর অযথা সংকীর্ণতা সৃষ্টি করত; যাতে সে (স্ত্রী) বাধ্য হয়ে স্বামী প্রদত্ত দেনমোহর এবং যা কিছু সে দিয়েছে তা স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দিয়ে তার থেকে নিষ্কৃতি লাভ করাকে প্রাধান্য দেয়। ইসলাম এই আচরণকেও অত্যাচার ও যুলুম বলে গণ্য করেছে।

'প্রকাশ্য অশ্লীলতা' বলতে ব্যভিচার অথবা গালাগালি ও অবাধ্যতাকে বুঝানো হয়েছে। এই উভয় অবস্থায় স্বামীকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, সে তার সাথে এমন আচরণ করবে যাতে সে তার দেওয়া মাল বা দেনমোহর ফিরিয়ে দিয়ে খুলআ' করতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য, স্ত্রী খুলআ' (ত্বালাক) নিলে স্বামীকে দেনমোহর ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। (দ্রষ্টব্যঃ সূরা বাকরার ২:২২৯ নং আয়াত)

এটা স্ত্রীর সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করতে বলার এমন নির্দেশ, যার প্রতি অতি তাকীদ করা হয়েছে এবং হাদীসসমূহেও এই বিষয়টাকে বড়ই গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। একটি হাদীসে আয়াতের এই অর্থটাকে ঠিক এইভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, ((لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ)) অর্থাৎ, "কোন মু'মিন পুরুষ যেন কোন মু'মিন নারীকে ঘৃণা না করে। তার কোন একটি অভ্যাস তার কাছে খারাপ লাগলেও অপরটি ভাল লাগবে।" (মুসলিম ১৪৬৯নং) অর্থাৎ, অশ্লীলতা ও অবাধ্যতা ব্যতীত অন্য কোন এমন দোষ যদি স্ত্রীর মধ্যে থাকে, যে দোষের কারণে স্বামী তাকে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন তাড়াহুড়া করে তাকে তালাক না দেয়, বরং সে যেন ধৈর্য ও সহ্যের পথ অবলম্বন করে। হতে পারে এতে মহান আল্লাহ তার জন্য অজস্র কল্যাণ দান করবেন। অর্থাৎ, সৎ সন্তানাদি দান করবেন কিংবা তার কারণে আল্লাহ তাআলা তার ব্যবসা বা কাজে বরকত দান করা সহ আরো অনেক কিছু দেবেন। অনুতাপের বিষয় যে, কুরআন ও হাদীসের এই নির্দেশনার বিপরীত পথ অবলম্বন করে মুসলিমরা আজ সামান্য ও তুচ্ছ কারণের ভিত্তিতে স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দেয় এবং এইভাবে তারা ইসলামের দেওয়া তালাকের অধিকারকে বড়ই অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে। অথচ এই অধিকার দেওয়া হয়েছে কেবল নিরুপায় অবস্থায় ব্যবহার করার জন্য; সংসারের বিনাশ, মহিলাদের উপর যুলুম এবং সন্তানদের জীবন বিনষ্ট করার জন্য নয়। এ ছাড়া এতে ইসলামের

বদনামও হয়। বলা হয় যে, ইসলাম পুরুষদেরকে তালাকের অধিকার দিয়ে নারীদের উপর যুলুম করার এখতিয়ার দিয়েছে। এইভাবে ইসলামের একটি অতি সুন্দর বৈশিষ্ট্যকে অন্যায় ও যুলুম বিবেচিত করানো হয়।

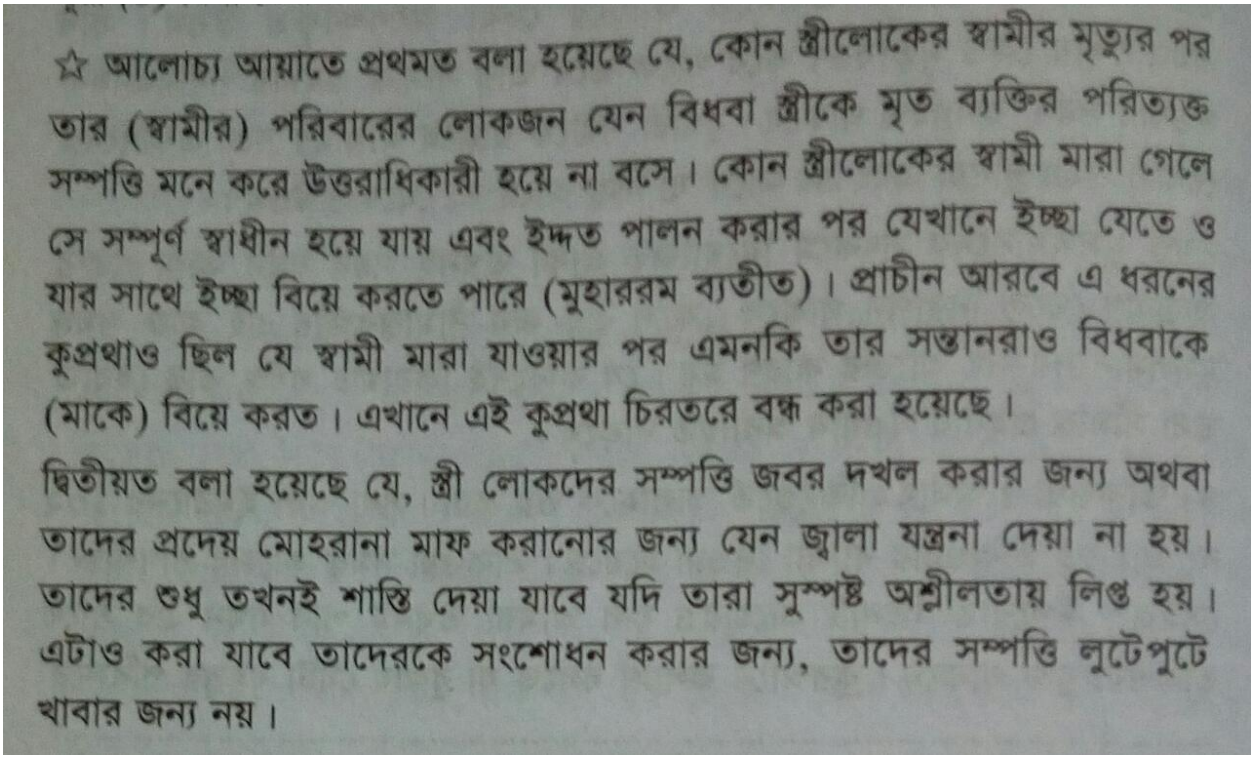

☆ আলোচ্য আয়াতে প্রথমত বলা হয়েছে যে, কোন স্ত্রীলোকের স্বামীর মৃত্যুর পর তার (স্বামীর) পরিবারের লোকজন যেন বিধবা স্ত্রীকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি মনে করে উত্তরাধিকারী হয়ে না বসে। কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যায় এবং ইদ্দত পালন করার পর যেখানে ইচ্ছা যেতে ও যার সাথে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারে (মুহাররম ব্যতীত)। প্রাচীন আরবে এ ধরনের কুপ্রথাও ছিল যে স্বামী মারা যাওয়ার পর এমনকি তার সন্তানরাও বিধবাকে (মাকে) বিয়ে করত। এখানে এই কুপ্রথা চিরতরে বন্ধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে, স্ত্রী লোকদের সম্পত্তি জবর দখল করার জন্য অথবা তাদের প্রদেয় মোহরানা মাফ করানোর জন্য যেন জ্বালা যন্ত্রনা দেয়া না হয়। তাদের শুধু তখনই শাস্তি দেয়া যাবে যদি তারা সুস্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। এটাও করা যাবে তাদেরকে সংশোধন করার জন্য, তাদের সম্পত্তি লুটেপুটে খাবার জন্য নয়।

তৃতীয়ত বলা হয়েছে বিয়ের পর যথাসাধ্য মিলেমিশে সদ্ভাবে জীবন যাপন করার জন্য। স্ত্রীলোকটি যদি সুন্দরী না হয় কিংবা তার মধ্যে যদি এমন কোন ত্রুটি থেকে যায় যার দরুন স্বামীটির পছন্দসই হতে পারেনা তাহলে সহসা মন খারাপ করে পরিত্যাগ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা কিছুতেই উচিত নয়। বরং যথাসম্ভব ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা অনেক সময় এরূপ দেখা গিয়েছে যে একজন স্ত্রীলোক সুন্দরী নয় কিন্তু তার মধ্যে এমন কতগুলো গুণ রয়েছে যা দাম্পত্য জীবনে রূপ সৌন্দর্য অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। সে যদি এই গুণগুলো যথাযথভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পায় তাহলে তার সেই স্বামীই যে একদিন মন খারাপ করেছিল এই গুণ বৈশিষ্ট্যও চারিত্রিক সৌন্দর্যের কারণে তারজন্য দেওয়ানা হতে পারে। অনুরূপভাবে দাম্পত্য জীবনের সূচনায় স্ত্রীলোকের কোন কোন জিনিস হয়ত স্বামীর নিকট অপছন্দনীয় হতে পারে এবং সেজন্য স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ভেঙ্গে পাড়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু স্বামী যদি ধৈর্য ধারণ করে স্ত্রীর অন্তর্নিহিত সমস্ত সম্ভাবনার প্রকাশ ও বিকাশ লাভের সুযোগ দেয় তবে একদিন সে নিজেই অনুভব করতে পারবে যে তার স্ত্রীর দোষ অপেক্ষা গুণই রয়েছে অধিক। অনুরূপভাবে স্বামীর ক্ষেত্রেও স্ত্রীর জন্য একই কথা প্রযোজ্য।

কাজেই দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করার ব্যাপারে কোনরূপ তাড়াহুড়া করা কিছুতেই সমীচিন হতে পারেনা। তালাক একেবারে সর্বশেষ অস্ত্র হিসেবে অনিবার্য পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে এর পূর্বে নয়। রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন 'তালাক জায়েয কাজ হলেও সকল কাজের মধ্যে আল্লাহ ইহাকেই বেশী অপসন্দ করেন।"

অতএব আমাদের উচিত পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মীতার মনোভাব নিয়ে সুখী সুন্দর পারিবারিক জীবন গড়ে তোলা।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কারো অধিকারে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা হারাম।

২. অন্যায়ভাবে স্ত্রীদের ওপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা হারাম।

৩. স্ত্রী যদি প্রকাশ্য কোন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তার থেকে মাহর ফিরিয়ে নিয়ে বিদায় করে দিতে হবে।

৪. মাহরে আধিক্যতা বৈধ।